পহেলা বৈশাখ যেভাবে পেলাম

ফতেউল বারী রাজা

অজানা কাল থেকে নববর্ষ মাস ছিল অঘ্রান বা অগ্রহায়ণ। বাংলার সুতাল আলউদ্দিন হোসেন শাহ হিজরি বা চন্দ্র বছরের হিসাব অনুসরণ করে প্রথম বঙ্গাব্দের শুরু করেন। যাতে ফসলের মৈসুম নির্ধারনের মাস ঠিক থাকত না, ফলে খাজনা আদায়ে অসুবিধা হত। সম্রাট আকবর যখন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভারত উপমহাদেশে শকাব্দ, কলাব্দ, বিক্রমাব্দ, গুপ্তসংবৎ শালিবাহন অব্দ, হর্ষাব্দ, পালাব্দ, লক্ষণ সংবৎ, জালালিসন, সিকান্দরসন ইত্যাদির অঞ্চল ভিত্তিক প্রচলন ছিল। আর সে জন্য কোনটিরই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ছিল না। তাই এহেন সমস্যার সমাধান কল্পে চারশত বছর পুর্বে মুঘল সম্রাট মাহমতি আকবর তাঁর রাজসভার রাজ জ্যোতিষী ও বিজ্ঞ পণ্ডিত আমীর ফতেউল্লা সিরাজীকে সৌরবছর ভিত্তিক ফসলীসন প্রবর্তনের নির্দেশ দেন।

আমীর ফতেউল্লা সিরাজী ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি (হিজরি ৯৬৩) সম্রাট আকবরের দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্টিত হওয়ার স্মৃতিকে চির স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে, ফসল তোলার সময় খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরি সালের সঙ্গে মিল রেখে অগ্রহায়ণের পরিবর্তে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিলকে বাংলা নববর্ষের শুরু পহেলা বৈশাখ ধরে সৌরমাস ভিত্তিক ৯৬৩ ফসলী সন গণনা করার রীতি প্রবর্তন করেন। সূর্যপরিক্রমার হিসেবে যে বর্ষ গণনা করা হয় তাকে সৌর সন বা বর্ষ বলে। এক্ষেত্রে পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। চন্দ্রপরিক্রমার হিসেবে যে বর্ষ গণনা করা হয় তাকে চান্দ্রসন বলা হয়। এক্ষেত্রে চন্দ্রের সময় লাগে ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের একটু বেশি। তাই চন্দ্রবর্ষের চেয়ে সৌরবর্ষে মোটামুটি ১১ দিন বেশি ধরা হয়। একারণে সৌরবর্ষ অপেক্ষা চন্দ্রবর্ষ বেড়ে যায়। একচন্দ্র মাস হয় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে।

শকাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের যথেষ্ট সম্পর্ক থাকার কারণে বাংলা সালের সঙ্গে শকাব্দের মাস গুলোকে যুক্ত করে বাংলা বার মাসের নাম রাখা হয়েছে। যার নাম করণ হয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্রের নামের অনুসরণে।

যেমন–
বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ,
জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ,
আষাঢ়া নক্ষত্র থেকে আষাঢ়,
শ্রবণা নক্ষত্র থেকে শ্রাবণ,
ভাদ্রপদা নক্ষত্র থেকে ভাদ্র,
আশ্বিনী নক্ষত্র থেকে আশ্বিন,
কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে কার্তিক,
পুষ্য নক্ষত্র থেকে পৌষ,
মঘা নক্ষত্র থেকে মাঘ,
ফাল্গুনী নক্ষত্র থেকে ফাল্গুন,
আর চিত্রা নক্ষত্র থেকে চৈত্র মাসের নাম করণ হয়েছে। কেবলমাত্র অগ্রহায়ণ মাসের নাম কোন নক্ষত্রের নামে হয়নি। পুর্বে অগ্রহায়ণ ছিল বছরের প্রথম মাস। অগ্র মানে পুর্ব এবং হায়ন মানে বর্ষ। এই জন্য এই নামকরণ হয়েছে।

৯৬৩ হিজরি সনকে ৯৬৩ বঙ্গাব্দ ধরে সৌর সন গণনা করা হয়। এর অর্থ বঙ্গাব্দের যে বছর জন্ম সে বছরই তার বয়স ৯৬৩ বছর। হিজরি ৯৬৩ সনে বঙ্গাব্দের ৯৬৩ বছর ধরে বাংলা সনের বয়স গণনা করা হয়। আর সে কারণে দেখা যায় হিজরি প্রথম থেকে ৯৬৩ বছর পর্যন্ত বঙ্গাব্দের প্রথম স্তর। যা চন্দ্র মাস ভিত্তিক। দ্বিতীয় স্তর শুরু ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ থেকে সৌর বছর ভিত্তিতে। সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্ব কালের ২৯তম বর্ষ (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ভারত উপমহাদেশের সর্বত্ত ব্যাপক ভাবে এই ফসলীসনের ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এই ফসলী সনই বাংলাসন বা বঙ্গাব্দ

হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সৌর মাসের প্রতিটি দিনের এক একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়েই ৩০ বা ৩১ দিনের পৃথক পরিচিতি চিহ্নিত হতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও এই রীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ পদ্ধতি মনে রাখা ছিল বেশ কঠিন ও জটিল। তাই সম্রাট শাজাহানের সময় এই কঠিন ও জটিল পদ্ধতি বাদ দিয়ে এক একটি মাসকে ৪ ভাগে ভাগ করে ৭ দিনে সপ্তাহ গণনা শুরু হয়। আর এই ৭ দিনের নাম সম্রাট শাহজাহানের দরবারে আসত এমন এক পর্তুগীজ মনীষীর পরামর্শ ক্রমে গ্রহ রাশি থেকে নির্ধারণ করা হয়।

যেমন–
SUN সূর্য থেকে রবি,
MONAN অর্থাৎ MON থেকে সোম,
MARS মঙ্গল গ্রহ থেকে মঙ্গল,
MERCURY বুধ গ্রহ থেকে বুধ,
JUPITER বৃহস্পতি গ্রহ থেকে বৃহস্পতি,
VENUS শুক্র গ্রহ থেকে শুক্র আর
SATURN শনি গ্রহ থেকে শনি।

আমাদের বাংলা একাডেমী বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালে ভাষা বিশারদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তে ১৩৭১ সনের বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ৫ মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত ৭ মাস ৩০ দিনে, অধিবর্ষে চৈত্র মাস ৩১ দিনে গণনা করার রীতি স্থির হয়। যে সাল ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে সেই সালকেই অধিবর্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলা সনের যুগোপযোগী এই সংস্কার বহু বছর পর ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বাংলা সন চলে আসছে। ''৯৬৩ হিজরী সনে প্রবর্তিত বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিন ছিল ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ। ১৪১১ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ শুরু হবে ১৪ এপ্রিল। এতে দেখা যায় ৪৪৮ বছরে পার্থক্য হয়েছে মাত্র তিনদিনের আর ভবিষ্যতে সে পার্থক্য এর চেয়ে একদিনের বেশি কখনো হবে না। মুসলমান কর্তৃক প্রবর্তিত বিজ্ঞান সম্মত হিজরি ভিত্তিক এই বঙ্গাব্দ বা বাংলসন নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরবের। যা বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ এবং ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাই অতি প্রত্যুষে সূর্যদয়ে সোনালী রশ্মির ছটায় পূর্বাচল উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে এদেশের আদি অধিবাসী এবং বাঙ্গালীরা বর্ষ পরিক্রমায় পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের সুচনা করে পরস্পর শুভ নববর্ষ শম্ভাষণ আর কোলাকুলি দিয়ে।

বাংলা বর্ষবরণে শিকড়ের পুনরুদ্ধার

মোহসিনা বেগম

আসুন মধ্যবিত্ত বাংগালী ঐতিহ্যের একটি সুদুর প্রশারী শিকড় পুনরুদ্ধার করি। সেই সাথে বিশ্বের ছোট ছোট জাতি ও গোষ্ঠির প্রতি, সহমর্মিতা ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ ''বিশ্ব প্রকৃতির কাজে আমাদের প্রাণের মহলে অপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান ক্ষেত্র তার চিত্র মহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহবান করে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণমিলন ঘটে না"।

বিমল কর যথার্থ বলেছেন " নববর্ষের ঐতিহ্য বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত একটি সুদুর প্রসারী শিকড় পুনরুদ্ধার করে"।

এক সময় গ্রাম বাংলার সামান্য লোকাচার অনুপ্রেরণা নিয়ে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় বাংগালীর নববর্ষকে একটি বিরাট ও ব্যাপক জাতীয় উৎসবে। আদিবাসীগণ বৈশাখীকে 'বৈসাবী' বলে থাকে। তাদের ধারণা বিবাশা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্ররের সাথে যখন সৌর অর্থাৎ সুর্যের বছরে একবার প্রনয় হয়, তখনই এই ধরার ভাজে ভাজে অর্থাৎ বাঙ্গালী বাঙ্গালীদের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মধ্যে বৈশাখী উৎসব পালন হয়।

ওদের কারো কারো মতে,
বৈসুক অর্থ বিশাখা নক্ষত্র
সাংগাই অর্থ সুর্য দেব
বিজু এক প্রকারের পাহাড়ী ফুল।
যে ফুল দ্বারা আদিবাসীরা
সুর্য ও নক্ষত্রের বাসর সাজায়।

আমরা বর্ষবরণ করি সুর্য উদয়ের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের "এসো হে বৈশাখ এসো এসো" গেয়ে। আর আদিবাসী চাকমাড়া ও মারমারা গায়,

"উত্তর মেঘে মেঘে মেঘলা দিবাপরে
মপরান জিদু মাগে
তারা লগে লগে।"

ওরা অর্থাৎ চাকমারা ও মারমারা মনে করে পাহাড়ী বনফুল বিজু ঘর টবে কিংবা ফুল দানিতে রাখলে পুণ্য বানের পুণ্য বার্তা বয়ে আনবে। আর নিমের ডাল ঘরে রাখলে দুঃখ জরা মুছে যাবে নতুন বছরে পুণ্যাত্মার বারতা সকল বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছাবে। আবার চৈত্র সংক্রান্তিতে পাঁচন রান্না করে। বিজু ফুল কর্নফুলি কাপতাইতে ভাসিয়ে চৈত্রের বিদায় ঘন্টা বাজায়। নববর্ষে যুবতী মেয়েরা পিঠা পুলি বানিয়ে আনন্দে মেতে উঠে বাজনার তালে তালে। রং আর নকসা ধরা পিঠা বানায় আয়েস করে। তারপর শোভা যাত্রা মেলা প্রাঙ্গানে জড়ো হয়ে জল ছিটানো, মন্দিরে নানারং এর মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে। দল বেধে গায়,
"চান্দোরো রোখাই তারো জ্বলে লংগিরে।"
তয়া ব্রন্নারে ব্রন্না পথ চিন্দিরে দিরে।"

অর্থাৎ হে পুর্ণিমা শশী তুমি যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ তা এই বিশ্ব ব্রন্নার দয়াতেই তোমার উজ্জল হাসিতে পথ চিনে নেই। তৎকালীণ প্যাকিস্তানী বেনিয়ারা বাংলা সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতা করলে প্রথম প্রতিবাদ স্বরূপ বৈশাখের প্রথম প্রহর ''ছায়া নট" রমনার বটমুলে নববর্ষ পালন এর আয়োজন করে ১৯৬৭ সালে।

ঐতিহ্যবাহী নদী বন্দর চাঁদপুরে ছিল গয়না সাজানো অনেকটা বজরা নৌকার মত বড় নৌকা। যা একবন্দর থেকে আরেক বন্দর এর আরতে পন্য সামগ্রী সরবরাহ করতো। শিশুদের মাঝে মিষ্টি বিতরন দুধ, কলা, মিষ্টি ফল ফলার গঙ্গী মাকে ভোগ দিতেন। এখনো দেন হিন্দু বনিকগণ। মুসলিম বনিকগণ মিলাদ শরীফ পড়ান, খোয়াজ খীঞ্জির আঃ এর নামে দোয়া বকসানো ইত্যাদি করে থাকেন। মাঝি ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগীতা, ইলিশপান্তা, চিংড়ী ভরতা আপ্যায়ন নৌকার উপরই বৈশাখী স্বাদ আস্বাদন এসব বিলুপ্তির পথে। চাঁদ সওদাগরের পুথি পাঠ, পুরান বাজারে গাদি সাইদ অত্যন্ত উল্যাসের সাথে গনেশ দেবতার গলে মাল্যদান অর্চনা গদি সাজানো প্রসাদ বিতরন ইত্যাদি। বর্তমান শুভ হালখাতা ও হয়।

সংগীত নিকেতন ও ললিতকলা আনন্দ শোভাযাত্রা করে থাকে। সংগঠন থেকে শুরু করে কালীবাড়ীর মোড়ে শেষ করে। সংগীত পরিবেশনা চলে অরুণ রবীকে বরণ করার ভিতর দিয়ে। ঢাকাইয়ারা ঘুড়ি উড়ানো মোরগের লড়াই দেখতো। ঢাকাইয়া কুট্টিরা রাজা বাদশা সেজে শোভা যাত্রা করে থাকে। এখনো মুন্সিগঞ্জের গরু দৌড়, ষাড়ের লড়াই ওখানকার ঐতিহ্য। চট্রগ্রামের বলীখেলা, রাজশাহীতে গম্ভিরা পরিবেশন করে নানা নাতি সেজে, আনন্দ উপভোগ করে। আবার সীমান্ত শহর দর্শনায় দুই বাংলার প্রাণের মেলা বসে 'নোম্যান্স লেন্ডে'। মনে হয় সবই এক সঙ্গো গেয়ে উঠে "মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম। আরও বলতে ইচ্ছে করে অন্নদাশংকর রায়ের ছড়াটি..

"তেলের শিশি ভাংলো বলে খুকুর 'পরে রাগ কর।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙ্গো ভাগ কর..
তার বেলা..তার বেলা..।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ভরা এই প্রাণের মেলা যুগ যুগ ধরে যেন অটুট থাকে।

সীমান্ত শহর দর্শনায় আরেকটি মনোমুগ্ধকর খেলা হয়, বাদ্যের তালে তালে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা। বন্ধুগণ আসুন এবার আমরা আন্তর্জার্তিক পর্যায়ে একটু দৃষ্টিগোচর করি- খ্রীষ্টপুর্ব তিন হাজার বছর পুর্বে দক্ষিণ ইরাকীরা বালী বপনের সময় 'আতিকু' নববর্ষ উৎসব পালন করতো। চীনারা দ্বাদশ চাঁদের রাতে এ উৎসব পালন করতো। ইরানে নওরোজ অর্থাৎ নববর্ষ আর কোরিয়ানরা 'মোহেবোহে মাহল হিপাহ দুসেত্তহে' মানে তোমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। ভিয়েতনামবাসী 'টেট সায়েন্স ডান বাটেট'। জাপানীরা 'সগাতু সুং' বন্ধুগণ আমাদের বাংলা ভাষা আন্তর্জতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছে বিধায় নিজের

ঘর চেনার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মনস্ক হয়ে বিশ্বের কয়েকটি দেশ সম্পর্কে সামান্য ধারনা দিলাম। প্রত্যেক জাতীর জীবনে এই নববর্ষ সুখ বয়ে আনুক।